



বীর শহীদ

মো: হাবিব

জন্ম তারিখ:

১ জানুয়ারি, ১৯৭৫

শাহাদাতের তারিখ:

২০ জুলাই, ২০২৪

বিভাগ:

ঢাকা সিটি

জেলা:

ভোলা

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা: ড্রাইভার,

শাহাদাতের স্থান : যাত্রাবাড়ী শনির আখড়া

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

মো: হাবিব পেশায় ছিলেন একজন প্রাইভেটকার চালক। তিনি ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ধলিগর নগর ইউনিয়নের চর মোল্লাজির (চতল বাজার) গ্রামের মো: শফিউল্যাহর ছেলে। এলাকাতে জায়গা জমি না থাকাতে ছয় সদস্যের বড় পরিবার নিয়ে ঢাকাতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। থাকতেন ঢাকার কদমতলী থানার পাটেরবাগ পানির পাম্প এলাকায় ভাড়া বাসাতে। তিনি অনেক ধরনের গাড়ি চালাতে পারতেন। নিজের ব্যক্তিগত কোন গাড়ি না থাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মালিকের কখনো সিএনজি, কখনো প্রাইভেটকার আবার কখনো ট্রাক চালাতেন এবং অন্যান্য কাজ যখন যে কাজ সামনে আসতো সেটা করেই নিজের সংসার সামলে নিচ্ছিলেন।

শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট

শহীদের বড় মেয়ে ফাতেমা আক্তারের জবানি থেকে জানতে পারা যায়, জুলাই ২০২৪ এর মাঝ থেকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল তখন থেকে তাঁর বাবা প্রতিনিয়ত ছাত্রদের যৌক্তিক দাবির স্বপক্ষে নিজেকে शामिल করেছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর পরিবারকে বিভিন্ন রকম কথা বলে বিষয়টি আড়াল করতেন। তিনি বাসার সবাইকে বলতেন যে, তিনি যাত্রাবাড়ী অঞ্চলে আছেন। সরাসরি নিজেই যে আন্দোলনে আছেন সে কথা পরিবারকে জানাতেন না। ফাতেমা আক্তার বলেন, তাঁর বাবা শারীরিক ও মানসিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী একজন মানুষ ছিলেন। ঘটনার দিন ২০ জুলাই তাঁর বাবা এবং তাঁর বাবার আরো কয়েকজন বন্ধু মিলে যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া অঞ্চলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দুর্দশার চিত্র অবলোকন করে তাদের মুখে সামান্য কিছু খাবার উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর সেই থেকে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা ও আশপাশের কিছু মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা উঠিয়ে এদিন খিচুড়ি রান্না করিতেছিলেন। খিচুড়ি রান্নার এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলতে থাকে।

পুলিশ যখন ধাওয়া দিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের তাঁদের রান্না করার স্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে তখন তাঁর বাবা এবং তাঁর বন্ধুরা নিরাপদ স্থানে সরে যান। কিছুক্ষণ পর তাঁরা ভেবেছিলেন পুলিশ ওখান থেকে চলে গেছে। এই ভেবে তাঁরা আবারো রান্নাছলের দিকে আসে কিন্তু তখনো পুলিশ সেই স্থানথেকে যায়নি এটা তাঁর বাবা বুঝতে পারেননি। এরপর পুলিশ তাঁর বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তখন সময় আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিট। পুলিশের ছোড়া গুলির একটি তাঁর বাবার পেটের ডানপাশে বুকের নিচ ভেদ করে বাহির হয়ে যায়। তাঁর বাবা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং বেশ কিছুক্ষণ সেখানে একা পড়ে থাকেন কারণ সেখানে তখনো পুলিশ অবস্থান করছিল। পরবর্তীতে যখন পুলিশ চলে যায় তখন আশপাশের লোকজন তাঁর বাবার কাছে যান।

এ সময় তাঁর বাবা বারবার উদ্ধারকারী ব্যক্তিদের বলছিলেন আমাকে দয়া করে বাচান আমার বাড়িতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে। আমাকে দয়া করে বাঁচান। তখন আশপাশের কয়েকজন মিলে তাঁর বাবাকে প্রথমে দেশ বাংলা হাসপাতালে নিয়ে যায় কিন্তু দেশ বাংলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এরকম সিরিয়াস রোগীকে চিকিৎসা না করানোর কথা জানায়। কারণ এরকম আহত রোগীকে চিকিৎসা করলে ক্ষমতাসীনদের রোশনালে পড়ার সম্ভাবনা আছে। পরবর্তীতে তাঁরা হাবিবকে নিয়ে ঢাকা মেডিকলে যায়। তখনো হাবিব জীবিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আনুমানিক ৩:৩০ মিনিটের দিকে তিনি ঢাকা মেডিকেলের ইমারজেন্সি তিন (৩) নং ইউনিটে মৃত্যু বরন করেন। আর সে সময়ই ফাতেমা আক্তার, তাঁর ভাই এবং তাঁর মা ঢাকা মেডিকলে পৌঁছান এবং তাঁর বাবাকে ইমারজেন্সিতে মৃত অবস্থায় পান।

ফাতেমা আক্তারের ভাষ্য মতে সে দৃশ্য ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। ঢাকা মেডিকেলের জরুরী বিভাগের বাইরে তখন অনেক পুলিশ ও আর্মি দাড়িয়ে ছিল। তাঁদেরকে সকলে নানারূপ ভয়-ভীতি এবং হুমকি ধমকি দিচ্ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লাশ হস্তান্তরের কথা বললে তাঁরা তাঁদেরকে স্থানীয় (ঘটনার স্থান) থানার ওসির লিখিত আবেদন আনতে বলে এবং উক্ত লিখিত আবেদন ছাড়া তাঁরা লাশ হস্তান্তর করবে না এই মর্মে জানায়। এরপর বাধ্য হয়ে তাঁর মা এবং তাঁর ভাই যাত্রাবাড়ী থানাতে যায় কিন্তু ঐ সময় থানার আশপাশে অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা ছিল। ছাত্রদের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ চলছিল তাঁরা কোনভাবে জান বাঁচিয়ে থানার ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু থানার ভিতরের পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁদের নানা রকম কথাবার্তা বলতে থাকে এবং বিভিন্ন রকম হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। তাঁরা তাঁদেরকে নানাজনের কাছে পাঠাতে থাকে এবং কোনভাবেই ওসি লিখিত দিবে না বলে জানায়। এমনকি তাঁরা তাঁর ভাইয়ের ঠিক বুকের মাঝ বরাবর বন্দুকের নল ধরে তাঁকে থানার ভিতরে গুলি করবে বলে শাসিয়ে চলে যেতে বলে। এ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা আবারও ঢাকা মেডিকলে ফিরে যায় এবং ঐ সকল ঘটনার বর্ণনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানায়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই লিখিত ছাড়া লাশ হস্তান্তর করতে পারবে না মর্মে জানায় এবং তাঁদের বলে তাঁরা যেন আবার থানায় ফিরে গিয়ে কোনমতে থানার ওসির হাত-পা ধরে হলেও লিখিত নিয়ে আসে। তাঁরা মা-ছেলে আবারো থানাতে ফিরে গিয়ে থানার পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করে লিখিত দেয়ার জন্য বলে। সর্বশেষ তাঁরা থানা থেকে ওসির লিখিত পায় এবং তা নিয়ে দ্রুত ঢাকা মেডিকলে যায়। এরপর ঢাকা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ তাদের লাশ হস্তান্তর করে। ইতোমধ্যে ২০ তারিখ পেরিয়ে ২১ তারিখ সন্ধ্যা হয়ে যায়। এদিকে লাশের অবস্থাও অনেক খারাপ হয়ে যায়। এমনকি ফাতেমা আক্তারের ভাষ্যমতে লাশ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে

থাকে। এমতাবস্থায় তাঁরা তাঁর বাবার লাশ নিজেদের গ্রামের বাড়ি ভোলাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তড়িঘড়ি করে লাশের গোসল, কাফন ও জানাযা শেষে জুরাইন কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের মন্তব্য

হাবিবের এক চাচা জানান, “হাবিবের বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। এলাকায় তাঁর কোনো জমি বা বাড়িঘরও নেই। পরিবার নিয়ে সে ঢাকায় থাকত।”

হাবিবের বড় মেয়ে কলেজছাত্রী ফাতেমা আক্তার বলেন, “ওরা আমাদেরকে এতিম করে কেন আমার অসহায় বাবাকে গুলি করে মেরে ফেললো? আমাদের এখন কী উপায় হবে?” তিনি আরো বলেন, “তাঁর বাবা গরিব ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁদের কখনো সেটি বুঝতে দেননি। তিনি অনেক বেশি পরিশ্রম করতেন কিন্তু আমাদেরকে তাঁর পরিশ্রম বুঝতে দিতেন না। তিনি তাঁর মেয়েদেরকে রানীর মত করে রেখেছিলেন। যত কিছু হোক না কেন তিনি বাড়িতে ফেরার পথে তাদের জন্য কিছু না কিছু খাবার নিয়ে বাড়িতে ফিরতেন। তাঁর বাবা তাঁদেরকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। তাঁদের পরিবারই যেন ছিল তাঁর বাবার সমস্ত পৃথিবী। আর তাঁরা সেই বাবাকে হারিয়ে ফেলল, যে আর কখনো তাঁদের জন্য আর খাবার নিয়ে ঘরে ফিরবে না। তিনি আরো বলেন, তাঁর মা এখন তাঁদের পরিবারের এবং ছোট ভাইবোনদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এত পেরেশান থাকেন যে রাতে ঘুমুতে পারেন না। আর তাঁর ছোট বোনটি এখনো ঘরের প্রধান দরজার কাঠামোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন কখন বাবা আসবে সেই অপেক্ষায়। কিন্তু ওর অবুখ মন জানে না তাঁর অপেক্ষার আর কখনো শেষ হবে না! এই পথে বাবা আর কখনো ঘরে ফিরবে না।”

হাবিবের একমাত্র ছেলে হাফেজ মো: জিহাদ (১৭) ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, “আমার বাবারতো কোনো দোষ নেই, তিনি কোনো রাজনীতির সাথেও কখনো জড়িত ছিলেন না। বিভিন্ন গাড়ি চালিয়ে আমাদের সংসার চালাতেন। আমার বাবার ধ্যান-জ্ঞান সবই ছিল আমাদের মা, তিন বোন ও এক ভাইকে ঘিরে। কিন্তু খেটে খাওয়া আমার এই বাবাটাকেই কেন গুলিতে নিহত হতে হলো?” জিহাদ আরো জানায়, “বাবাকে হারিয়ে আমরা এখন চোখে অন্ধকার দেখছি। আমার বড় বোনটি আইএ পরীক্ষা দিতেছে। পাঁচ বিষয় পরীক্ষা শেষও হয়েছে। বাবা তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। আমার আরো ছোট দুই বোন রয়েছে। আমি সামান্য যা আয় করি তা দিয়ে আমার পড়ালেখার খরচই মেটানো যায় না। আমাদের কথা চিন্তা করে আমার মায়ের এখন রাতে ঘুম হয় না।”

শহীদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

হাবিবের বড় মেয়ে ফাতেমা আক্তারের ভাষানুযায়ী তাদের গ্রামের বাড়িতে বেশ কিছু জমি আছে কিন্তু সেগুলো অন্যরা জবরদখল করে আছে। এখন তাদের নিজেদের দখলে কোন সম্পত্তি নেই। এগুলো এখন আর উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আর ঢাকাতে তাঁর বাবা ড্রাইভার হিসেবে কাজ করতেন। নিজের মালিকানায় গাড়ি না থাকায় ভাড়া বিভিন্ন মালিকের গাড়ি চালাতেন। মাঝে তাঁর মালিক গাড়ি বিক্রি করে দিলে তিনি বেকার হয়ে পড়েন এবং চাকরি চলে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন তিনি কাজ ছাড়াও ছিলেন।। তাঁর বাবা তাঁর (ফাতেমা আক্তারের) এইচএসসি পরীক্ষার সময় পরিবারের খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন এজন্য তাঁর ভাই হাফেজ রিহাতকে কারখানার কাজে লাগিয়ে দেন, যাতে সে পরিবারকে সাহায্য করতে পারে। আর সে নিজেও দুইটি টিউশনি করিয়ে দুই ভাই-বোন মিলে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করছিলেন। আর তার মাঝে ঘটে গেছে এই দুঃসহ ঘটনা।

শহীদের পরিবারের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। শহীদের পরিবারের সহযোগিতা সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হলে

১. জরুরী ভিত্তিতে শহীদের পরিবারের থাকার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন সুতরাং তাঁদের থাকার জন্য স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া কাম্য।
২. শহীদের পরিবারের জন্য এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে যাতে পরিবারটি বর্তমানে নিজেদের চালিয়ে নিতে পারে।
৩. শহীদের বড় মেয়ে ফাতেমা আক্তারের জন্য স্থায়ীভাবে কোন চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সে তাঁর পরিবারের হাল ধরতে পারে এবং তাঁর মা ও ছোট ভাইবোনদের সুন্দর মত দেখাশোনা করতে পারে। বাবার রেখে যাওয়া স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে পারে।
৪. যেহেতু শহীদের ছেলে পবিত্র কোরআনের হাফেজ সেহেতু হাফেজ ছেলের জন্য তাঁর উপযোগী কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কোনো চাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং তাঁর ছোট বোনদের সম্পূর্ণ সরকারি খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৫. যেহেতু শহীদের মেজো মেয়ে কিছুটা হলেও শারীরিকভাবে অপ্রকৃত সুতরাং তাঁকে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম : মো: হাবিব

পিতা : মৃত মো: শফিউল্লাহ

মাতা : মৃত আছিয়া খাতুন

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চর মোল্লাজি(চতল বাজার), ইউনিয়ন: ধোলিগর নগর, থানা: লালমোহন, জেলা: ভোলা

বর্তমান ঠিকানা : মহল্লা: দক্ষিণ দনিয়া, পাটের বাগ, এলাকা: পাটের বাগ, পানির পাম্প, থানা: কদমতলী, জেলা: ঢাকা

ঘটনার স্থান : যাত্রাবাড়ি শনির আখড়া

আক্রমণকারী/ঘাতক : স্বৈরাচার সরকারের পুলিশ ও ছাত্রলীগ

আহত হওয়ার সময়কাল : ২০ জুলাই, ২০২৪, ২:৩০ ঘটিকায়

মৃত্যুর তারিখ ও সময় : ২০ জুলাই, ২০২৪, ৩.৩০ ঘটিকায়

শহীদের কবরের অবস্থান : জুরাইন কবরস্থান, ঢাকা

পরিবারের মোট সদস্য : ৬ জন

১। স্ত্রী: নাম: আয়েশা বেগম, পেশা: গৃহিণী

২। বড় মেয়ে: নাম: ফাতেমা আক্তার, বয়স: ২০, লেখাপড়া: এইচএসসি, কমলাপুর শেরে বাংলা কলেজ

৩। ছেলে: নাম: হাফেজ মো: রিহাদ হোসেন, বয়স: ১৭

৪। মেজো মেয়ে: নাম: হাবিবা ইসলাম কুলসুম, বয়স: ৭, লেখাপড়া: প্লে

৫। ছোট মেয়ে: নাম: হুমায়রা ইসলাম আয়াত, বয়স: দেড় বছর

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। (সূরা আল-বাকার ২:১৫৪)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

